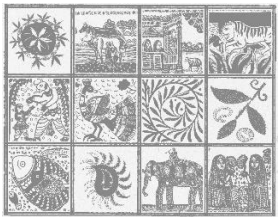

শোভন সংস্কৃতির রূপরেখা

শোভন সংস্কৃতির রূপরেখা

খান মাহবুব

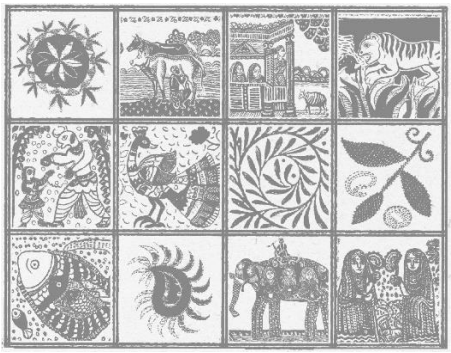

শোভন সংস্কৃতির রূপরেখা
খান মাহবুব

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
রাসেল আহমেদ রনি

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৩৭৫ টাকা

Shovon Shongsrikti Ruprekha by Khan Mahbub Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Published: February 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 375 Taka RS: 375 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-98456-5-2

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উ ৎ স র্গ

চারপাশে দম্ভ অহং দেখতে দেখতে হাপিত্যেশ আমার। খুব সাধারণ চাওয়া সদাচার– যেন যোজন যোজন দূর। তবুও ক্রান্তিকালে দু-একজনের সাথে কথা হয়, লম্বা ভাবনা বিনিময় হয়। প্রাপ্তির ঝুলিতে জ্ঞান, দর্শন ছাপিয়ে আমার মনে যোজনা হয় সদাচার, সম্প্রীতি ও স্নেহের উত্তাপ– সেটাই অনেক স্বস্তিকর ও প্রশান্তির।

শ্রদ্ধাসহ অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

বইয়ের দাগ-খতিয়ান

সব সৃজনশীল লেখনির একটা সাধারণ গন্তব্য থাকে সমাজের জন্য শোভন জমিন সৃজন। এজন্য লেখকদের চেতনার ফেরিওয়ালা বললে বোধকরি খুব একটা বাড়িয়ে বলা হবে না। তবে ব্যতিক্রম যে নেই সে কথা দিব্যি কেটে বলা যাবে না। মানুষের সাধারণ প্রপঞ্চ ইতিবাচকতা ধারণ করা। সেই বিশ্বাস থেকে নানান জনের হরেকরকম লেখামঞ্জরি দৃশ্যমান হয়। আমিও লিখি অন্তর গরজ থেকে। নিজেকে সঠিক পথের দিশা দিয়ে স্বস্তিতে জীবন যাপনের জন্য। আর আমি তো শুধু আমার দেহ কাঠামোতে থিতু নই– চারপাশটা মিলেই আমি। তাই আমার কর্মের প্রভাবক আমার পরিমণ্ডল। যদি আমার লেখনি কালেভদ্রে চারপাশের মানুষের মনের ঈশাণ কোণে একটু দোলা দেয়-সেটাও মঙ্গলের।

জীবনের আয়তনের পঞ্চাশ পেরিয়ে মধ্যগগণে এখন মনে হলো বিভিন্ন লেখার মধ্য থেকে কিছু লেখা বিষয়ভিত্তিক সূচি করে এক মলাটে বন্দি করা জরুরি। এই জন্যই এই প্রবন্ধ গ্রন্থের অবতারণা। এই গ্রন্থের বিশেষত্ব হলো নানা মাত্রিকতা। সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধান থেকে, গ্রন্থ ও গ্রন্থমেলা, আঞ্চলিক ইতিহাসের স্মারক, প্রকৃতি ও পরিবেশ সর্বোপরি শোভন বাংলাদেশের সন্ধান করা হয়েছে। গ্রন্থের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সংযোগ সাধন করা হয়েছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন, দর্শন ও ব্রত। এই তালিকায় যুক্ত আছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, কেদারনাথ মজুমদার প্রমুখ।

গ্রন্থটিতে কোনো প্রবন্ধকে বিচ্ছিন্নভাবে না ছেপে একই বিষয়ের কয়েকটি প্রবন্ধকে একসাথে সন্নিবেশ করা হয়েছে, যাতে উল্লিখিত বিষয়ে পাঠক সম্যক ধারণা পেতে পারে।

গ্রন্থ ও গ্রন্থমেলা বিষয়ক প্রবন্ধগুলো পাঠান্তে পাঠক বাংলাদেশের গ্রন্থ ও প্রকাশনার অঙ্কুর থেকে বিকাশ পর্বের গতি-প্রকৃতি অবলোকন করতে পারবে। পাশাপাশি বাংলাদেশের বইমেলার প্রাকপর্ব থেকে বর্তমান গতি-প্রবাহ সর্ম্পকে জানতে পারবে। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধকালীন আমাদের প্রকাশনা কিভাবে স্বল্প মাত্রায় ক্রিয়াশীল ছিল সে বিষয়েও জানা যাবে। বলাবাহুল্য মুক্তিযুদ্ধকালীন পত্র-পত্রিকাসমেত বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণ মিললেও প্রকাশনা নিয়ে সুনির্দিষ্ট লেখা ইতিপূর্বে আমাদের চোখে পড়েনি। সেই বিচারে "মুক্তিযুদ্ধকালীন আমাদের প্রকাশনা" প্রবন্ধ একটি নতুন যাত্রার স্মারক। কপিরাইট নিয়ে প্রবন্ধ মর্যাদার দাবির যোগ্য।

সংস্কৃতির বিবিধ অনুষঙ্গ নিয়ে প্রবন্ধের মাধ্যমে বারবার খোঁজ করা হয়েছে আমাদের ভূমিজ সংস্কৃতির। তাগিদ আছে মাটিবর্তী সংস্কৃতিতে ফেরত যাবার।

বাঙালির উৎসব, পার্বন-এর বাঁক বদলের পরিধিতে হেঁটে এই ভূমিতে আত্মীকৃত উৎসবের ব্যবচ্ছেদের প্রয়াস রয়েছে।

ইতিহাস ও ঐতিহ্য পর্বে ময়মনসিংহের রাজাদের শিকারের বৃত্তান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া আঞ্চলিক ইতিহাসের হরেক পার্বন যুক্ত আছে। পৃথিবীর প্রকৃতি ও মানুষের মনোভূবনের পরিবর্তন গত এক শতাব্দীতে দ্রুত ও বিস্ময়করভাবে হয়েছে। এই ধারায় প্রকৃতি থেকে ছেদ পড়েছে বন-বনানী, ফুল-পাখি, নদ-নদী ও সাংস্কৃতির বহমান অনুষঙ্গ। বিভিন্ন বিষয়কে শিরোনাম করে কয়েকটি প্রবন্ধমঞ্জরি স্থান দেওয়া হয়েছে এইগ্রন্থে। বর্তমান প্রজন্ম এসব বিষয় পাঠান্তে অনুধাবন করতে পারবে প্রকৃতি থেকে বঙ্গভূমির উপাদান কতো দ্রুত লয় পাচ্ছে। অধুনালুপ্ত বিষয় সর্ম্পকে জেনে প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে জাগরুক হতে পারবে।

বর্তমান সময়ের প্রবণতা হচ্ছে একের ভেতর অনেক কিছুর সম্মিলন। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বইটি চাহিদার প্রতি বিবেচনা রেখে বিন্যাস করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পাঠক চাহিদার বিষয়টি অগ্রগণ্য বলে মান্য করা হয়েছে।

যেকোনো গ্রন্থরচনা ও প্রকাশনা একটি শ্রমনিবিড় বিষয়। এক্ষেত্রে লেখকের শ্রমের সাথে অতি অবশ্যই যুক্ত থাকে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সংযুক্ততা। শুধু তাই নয় পাণ্ডুলিপি থেকে বই এই যাত্রায় বহু মানুষ ও বহু বিষয়ের সংশ্রেষে একটি পাণ্ডুলিপি বই আকারে দুই মলাটে বন্দি হয়। প্রকাশকসহ সৃজন সারথি সবার প্রতি অগণন কৃতজ্ঞতা। প্রকাশনা একটি চলমান প্রক্রিয়া। সংযোজন-বিয়োজন প্রকাশনায় অংশ ও চলমান ধাপ। ফলে এই বই প্রকাশের পর যখন পাঠবস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হবে তখন ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি প্রক্ষেপণের ফলে বইটির উৎকর্ষ সাধনের পরামর্শ আসবে। আমি সেই পরামর্শের জন্য পথ চেয়ে রই... সকলের জন্য শুভাশিস।

১৮ অক্টোবর ২০২৩

খান মাহবুব
গবেষক ও প্রাবন্ধিক
প্রভতী-৫, ধানমন্ডি, রোড-৭
ঢাকা-১২০৫

সূ চি প ত্র

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

শোভন সংস্কৃতির রূপরেখা ১১
নগর সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধানে ২০
বদলে যাওয়া পৃথিবী বদলে যাওয়া সংস্কৃতি ২৭
বাংলার সাহিত্য সম্মেলন ৩০

ইতিহাস ও ঐতিহ্য

টাঙ্গাইল জেলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি ৫১
শিকার রোমাঞ্চে ময়মনসিংহের রাজা-জমিদার ৬৭
কালের পথচলায় কাগমারী সম্মেলনের সাংস্কৃতিক পর্ব ৭৬

বই ও বইমেলা

বাংলাদেশের বইমেলার অঙ্কুরকথন ৮৮
পূর্ববঙ্গের সেইসব বইমেলা ৯৪
মুক্তিযুদ্ধকালীন আমাদের প্রকাশনা ১০০
নতুন কপিরাইট আইন ২০২৩ : চাহিদা ও যোগানের হিসেব-নিকেশ ১০৬

বরেণ্য ব্যক্তি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : কালে ও কালান্তরে ১১২
মাইকেল মধুসূদন দত্ত : সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে ১১৯
শতকের দ্রুতিতে নজরুলের 'অগ্নি-বীণা' ১২৪
কেদারনাথ মজুমদার : নির্মাণ-বিনির্মাণের আখ্যান ১৩৯

শোভন সংস্কৃতির রূপরেখা

সংস্কৃতি যাপিতজীবনের পরিমণ্ডল। যা মানুষ ধারণ করে, বহন করে, মান্য করে সেটাই সেই সমাজের সংস্কৃতি। বলাবাহুল্য সংস্কৃতি সমাজ-ভূগোল, পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা আবর্তিত ও বিবর্তিত। সংস্কৃতি সভ্যতার হাত ধরেই পথ চলেছে। সংগত কারণেই সংস্কৃতির বাঁকও সতত পরিবর্তনশীল চলক। সংস্কৃতির স্বরূপ বোঝা যায় কিন্তু সর্বজনমান্য পরিসর নির্ধারণ জটিল। এ নিয়ে সমাজ-সভ্যতাভেদে ডিসকোর্স ছিল এবং আছে। সংস্কৃতি শিল্পের ধারাবাহিকতা ও নান্দনিক বোধের পরিচয় নিয়ে এগিয়ে যায়। প্রজ্ঞা, সজ্ঞা, ইত্যাদির সম্মিলন সমাজকে শোভন সংস্কৃতির সন্ধান দেয়—ইতিহাস সে কথাই বলে।

সংস্কৃতির প্রবহমানতা, নিজস্বতা স্বকীয় যার মধ্যেই আবার জাতিসত্তার পরিচয় পরিস্ফুট হয়। সংস্কৃতি একটা সমাজের অদল-বদলের সাক্ষ্য বহন করে। একটি জনপদের সংস্কৃতিতে বাহির থেকে অনেক বিষয় প্রবেশ করে এবং কিছু বিষয় বাহিরে যায়। এতে করে সংযোজন ও বিয়োজনের ঘটনা ঘটে নানান অনুসঙ্গের। এজন্যই সংস্কৃতি জীবন চেতনাকে-কৃষিকর্ম, শিল্প, পোশাক-পরিচ্ছেদে, লোকচারে, ভাষায়, লিপিশিল্পে, ধর্মদর্শনে, খাদ্যে, শিল্পকলায় প্রভাবক হিসেবে ক্রিয়াশীল। সব মিলিয়ে সংস্কৃতি কালান্তরের মিলনতীর্থ।

ঋদ্ধ সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ সমাজে প্রাগ্রসর হিসেবে বিবেচ্য। এজন্য সমাজের চাওয়া শোভন সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ। সংগত কারণেই সংস্কৃতির সাথে সদাচারের যোগসূত্র রয়েছে। সদাচার তো মানবিক গুণের অনন্য পর্যায় যা অপরের মন জয় করে এগিয়ে চলে।

সমাজজীবনে মানুষ পারস্পরিক নির্ভরশীল তাই শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সহানুভূতিশীল সমাজে সদাচার অবশ্য কাম্য। মানুষের কাছে সবচেয়ে গুরুত্ববহ প্রার্থিত গুণটিই হলো সদাচার। সদাচার মনের কু-প্রভাব উপেক্ষা করে বা নিয়ন্ত্রণ করে এগিয়ে চলে। এটাই তো সাম্য সমাজ গঠনের অন্যতম নিয়ামক। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় যে অস্থিরতা চলছে তা ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে সদাচারের অপ্রতুলতার অন্যতম কারণ। সদাচার ও শুদ্ধ আচরণ ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের সমৃদ্ধির অনুঘটক। সদাচারের কাম্যমান সুনির্দিষ্ট করা কঠিন হলেও এর পরিধি বা আওতা অনুমেয়। আজ সমাজে সৌভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির যে অভাব তার বেদীমূলে রয়েছে সদাচারের চাষাবাদের ঘাট্‌তি। মূলত সততা, সহিষ্ণুতা, শৃঙ্খলা,

কর্তব্যবোধ, সৌজন্যবোধ, নৈতিকতা ইত্যাদির সু-সমন্বয়ই হচ্ছে সদাচার। সদাচারের যথাযথ অনুশীলনে শান্তি মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। ফলে সদাচার মনস্তাত্ত্বিক ও অবস্থাবাচক উপাদান হিসেবে জীবনাচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। এজন্যই সদাচার শোভন সংস্কৃতির উপকরণ। সদাচারের অনুপস্থিতির ফলেই আমাদের সমাজযন্ত্রে চিন্তার দৈন্যতা ও দর্শনের দারিদ্র্য বহমান।

সংস্কৃতি ব্যক্তির আচার-আচরণের মধ্যে ক্রিয়াশীল বলে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক বন্ধনময়। সমাজের ভেতর থেকেই সংস্কৃতির স্বরূপ প্রকাশ পায় ব্যক্তির জীবন রীতিতে এবং সারস্বত সাধনার মাধ্যমে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। সংস্কৃতির দ্যোতক হচ্ছে ব্যক্তি ও সমাজ। সমাজ তো ব্যক্তিতে ঘিরেই তাই সমাজের শাস্ত্র, লোকাচার, অনুশাসন, পুরাণ, লোকায়ন সব কিছুই সংস্কৃতি ধারণ করে।

বাঙালির গৃহীমন ও পারিবারিক সত্তা দীর্ঘ সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ফল। ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি কাল প্রবাহে এগিয়ে যায় এবং সংযোগ ঘটায় বিভিন্ন সমাজে। এটাই সংস্কৃতির রীতি। আমরা যে নবজাগরণের কথা বলি আমাদের সমাজে তার ভিত্তি ছিল ইউরোপের রেনেসাঁসের মাধ্যমে। কেন্দ্রভূমি ছিল ইতালি। ইতালি নব জাগরণের পূর্বসূত্র ছিল গ্রীস ও রোম। সেই আলোকরশ্মি এসে পড়েছিল ইতালিতে। সেই আলো আভা ছড়িয়ে ইউরোপের ব্যক্তি ও সমাজে সাংস্কৃতিক জাগরণ ঘটিয়েছে। এই ধারার অনুগমন হয়েছে ভারতীয় সমাজে। ভারতীয় সমাজে ইউরোপীয় সমাজের সংস্কৃতির প্রবাহকে সহজ করেছে তাদের উপনিবেশ কাঠামো। প্রাচীনকালে প্রাচ্য সংস্কৃতি ভারতে বাসা বেধেছিল পরবর্তীতে আধুনিকতার দাওয়াই পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব অনুগমন হয়েছে এটাই সমাজে সংস্কৃতির কালের হাওয়া। এতে প্রকাশ প্রায় সংস্কৃতির গতিপ্রবাহের ধারা।

ব্যক্তির সদাচারের উপর সমাজের চিত্র উঠে আসে। কারণ সমাজে বাসরত মানুষের আচরণ ওই সমাজের গতি প্রকৃতির নির্দেশক। একটা সময় ভারতীয় সমাজে সনাতনী ব্রাহ্মণ্যবাদের বর্ণাশ্রয়ী নীতির কড়াকড়িতে সমাজ ছিল বর্ণ, বর্ণ-সংকর ও তফসিলি বর্গের মধ্যে শতধা খণ্ডিত। সনাতনী সমাজের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার হাত হতে নিস্তার লাভের মানসে পশ্চিম হতে আগত মুসলিম সুফি-সাধকদের সদাচারের দাওয়াতে সাম্যের সমাজে প্রত্যয়ে নবধর্ম ইসলাম গ্রহণ করল ভারতীয় জনগণ। সমাজ-ও সংস্কৃতিতে ইসলামি বিভিন্ন রীতি ও আচার ভারতীয় সমাজে থিতু হলো। অর্থাৎ সংস্কৃতি ও সদাচার সবসময় অভিযোজন করেছে চাহিদা, উপযোগিতার সাথে।

রাজনীতিতে সংস্কৃতি সঠিক দিশা নির্দেশ করে জ্বালানি সরবরাহ না করলে রাজনীতি অভিলক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। কারণ সংস্কৃতি সামগ্রিক পারিপার্শ্বিকতাকে ধারণ করে বিরাজমান। বৃহৎ ভারতীয় সংস্কৃতির বড় কাজ ছিল জাতীয় রাজনীতিতে চিন্তা প্রবহ করা। রাষ্ট্র সমাজের দেহ। রাজনীতি রাষ্ট্রকে সুন্দর রাখার নিমিত্তে রত। ব্যক্তির ওপর যেহেতু সংস্কৃতি ক্রিয়াশীল ফলে সংস্কৃতি যদি প্রয়োজনের তাগিদে

আবদ্ধ না থেকে সদাচারযুক্ত সুমানসের রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে না তোলে তবে সভ্যতা এগিয়ে যায় না বা রাজনীতি অগ্রগামী হয় না। সমাজ বা রাষ্ট্র সুশিক্ষার ব্যবস্থা করলেও সুশিক্ষিত হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে সামাজিক পরিবেশ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর। ব্যক্তি সৃষ্টির জন্যই সমাজসৃষ্টি—এর মধ্যেই রাজনীতি ও সংস্কৃতির বাস। সমাজ সৃষ্টির মডেলের প্রেসক্রিপশন পাওয়া যেতে পারে কিন্তু ব্যক্তির বিকাশে ধরাবাধা পথ নেই। প্রথম দিকে বিদ্যালয় কিছুটা সহায়তা করে কিন্তু আসল কাজটুকু ব্যক্তির নিজেরই করে নিতে হয়।

ব্যক্তিমুক্তি তথা চিন্তাভাবনার স্বাধীনতার যে তাগিদ রয়েছে তা সংস্কৃতি চর্চা ও ভেদহীন রাজনৈতিক পরিবেশেই বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়।

সভ্যতার প্রভাত বেলায় শিকার করতে এসে মানুষ কোম ভিত্তিক সমাজ গঠন করে। কিছু মানুষ সমাজকে এগিয়ে নিতে কোম প্রথার মাধ্যমে সমষ্টিক উন্নয়নের রূপকল্পের স্বপ্ন দেখেন এটাই রাজনৈতিক সংস্কৃতি। পাশাপাশি কিছু মানুষ শিকারে অংশ না নিয়ে অস্ত্র ভাড়ার কাজে নিজেদের যুক্ত করেন কৌশলে অল্প পরিশ্রমে বেশি সুবিধার জন্য। সমাজ সেই পর্বেই বিভাজিত হয়ে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের বসবাসের যাত্রা শুরু হয়। নানান অভিধায় বিভাজিত সমাজেই আজকের অবস্থান। আজ বস্তুগত উন্নয়ন চলছে তবে তা আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে শোভন সংস্কৃতির বৈপরীত্যে দেখানিপনার রাজনৈতিক বস্তুবাদী বিষয়।

উন্নয়নের দৌড়ে মানুষ বস্তুনির্ভর জীবনে অভ্যস্ত হয়ে বাঙালির চিরায়ত বন্ধনময় সমাজ হতে প্রতিদিন বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতিতে নদ-নদী, বন-বনানী, পশু-পাখির লয়-ঘটছে তেমনি মানুষের মন জমিন থেকে চলে যাচ্ছে শুভবুদ্ধি, সদাচার ইত্যাদি। এসব বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক উন্নয়ন দর্শন অনেকাংশে দায়ী। এখন রাজনৈতিক উন্নয়নের নির্ণায়ক হচ্ছে ইট, বালু, পাথর নির্ভর অবকাঠামো। বিশ্বায়নের হাওয়ায় মানুষের একদণ্ড দাঁড়াবার সময় নেই। প্রতিটি মানুষ যেন যন্ত্র। তার মনোভুবনে বসবাসের সময় কই। নন্দনকলার বিভিন্ন শাখার উপকরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে মানুষ যে নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চা করবে বিশ্ব রাজনীতিতে সেসবের ভাবনার ফুরসত নেই। রাজনীতি টিকে থাকার বাস্তবতা শিখিয়ে আমার দিয়েছে আধুনিক শহরে ফ্ল্যাট কেন্দ্রিক বসবাসের বিচ্ছিন্ন সংস্কৃতির সন্ধান। সমাজ ব্যবস্থা প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে, আমরা দিনদিন অচীন হয়ে উঠছি। যান্ত্রিক দুনিয়ার মানুষও যেন আজ যন্ত্র। অথচ আমরা তো বাঙালির নিজস্ব মাটির সংস্কৃতি দিয়ে দেশকে সাজানোর কথা সাথে সারথি থাকবে আমাদের ভূমিজ অনুভূতি সৌন্দর্যবোধ যা আমাদের সংস্কৃতি থেকে অঙ্কুরিত। কিন্তু আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি!

সংস্কৃতি ও রাজনীতির একটা মেলবন্ধন হচ্ছে মানুষের কল্যাণ। এ জন্যই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কল্যাণ রাষ্ট্রের চাহিদা রয়েছে। রাষ্ট্র ও সমাজ যেহেতু একটা অদৃশ্যমান সত্তা কিন্তু তাদের উপস্থিতি ও কর্মযোগ রয়েছে। নাগরিকের কল্যাণে

সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র কিছু রীতি ও নিয়মের রজ্জুতে চলে। কিন্তু মানুষের স্বাধীন মন সমাজ থেকে বিচিত্র স্বাদ গ্রহণ করলেও, দায়বদ্ধ থাকলেও সব সময় সমাজের রীতি, রাজনীতি মানতে চায়না এজন্য দ্বন্দ্বও তৈরি হয়।

রাজনীতি ভাবের চেয়ে আইনকে, প্রবণতার চেয়ে পদ্ধতিকে বড় করে দেখছে বলে কখনো কখনো মানুষের আন্তরিক বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্প-সংস্কৃতির জগৎ ব্যক্তিমনের আত্মপ্রকাশের জগৎ। তাই রাজনীতি বস্তুতাত্ত্বিক অভিলক্ষ্যের সঙ্গে সব সময় একতালে চলতে পারে না। রাজনীতিতে ব্যক্তি স্বাধীনতা অনেক সময় উপেক্ষিত হয় গোষ্ঠীর চাহিদা সামনে সমাসীন হয় কিন্তু সংস্কৃতি তো সহজাতভাবে চায় ব্যক্তিমুক্তি অনুভূতি ও চিন্তাভাবনার মুক্তি। যদিও সমাজ বাস্তবতায় বর্তমানে সংস্কৃতির প্রবাহ এই সহজাত চাওয়াকে নিশ্চিত করতে পারে না। তবে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ যেমনই হোক মানুষের মুক্তির দ্বারটি খোলা রাখা দরকার; নইলে জীবনের পরম ঐশ্বর্য উপলব্ধি হয় না এবং সভ্যতার আমদানি ব্যাহত হয়।

সংস্কৃতি, রাজনীতি সদাচার সমাজের পাটাতন। তাই এদের মধ্যে ভারসাম্য প্রয়োজন। তবে এসবের প্রকাশ ঘটে আচরণে। এই আচরণ বিষয়ে দৃষ্টি প্রক্ষেপ থাকে বেশি রাজনীতি ও প্রশাসনের ওপর। কারণ তাদের আচরণ দর্শনই সমাজকে মূর্ত করে। সমাজের মানবিক বোধের মঙ্গল চেতনা প্রকাশ্যে আসে দেশের রাজনীতির ও প্রশাসনের সদাচারের উপর।

প্রাচীন সভ্যতার তীর্থ ভূমি এথেন্স বা রোমের কল্যাণ রাষ্ট্র বিনির্মানের খাম-খোটা ছিল নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সদাচার, নিষ্ঠা ইত্যাদি। এসবের উপর ভিত্তি করেই মানবিক সভ্যতার বীজ রোপিত হয়েছিল যার কর্ষণ এখনো সমাজে আদৃত। সদাচার কোনো স্থূল বিষয় নয়। ধারণ করে এবং যোগসূত্র রক্ষা করে অনেক বিষয়ের সঙ্গে। এজন্য নীতিবোধ, শিষ্টাচার, মানবিকতা, নৈতিকতা ইত্যাদির সম্মিলিত মঞ্জুরির প্রকাশ ঘটে সদাচারের ভেতর।

স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর করোনায় অভিঘাত বিশ্বকে নতুন করে পরিচিত করছে। রাষ্ট্র প্রশাসন এখন নতুন পরিবেশে টিকে থাকার স্বার্থে লোকপ্রিয় হতে মগ্ন। এই কালপর্বে ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্বকে নতুন ধ্রুপদে হাজির করেছে। রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো এখন মিশ্র অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে চলমান। বিশ্বায়ন যেমন সব সুবিধাকে একত্র করে সবাই মিলে ভোগ করতে চায় রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রশাসন তেমনি সুযোগ-সুবিধার পরিসর বাড়তে মশগুল। এজন্যই প্রশাসনের সেবার মান বাড়াতে 'শুদ্ধাচার' নামীয় কর্মকৌশলকে গুরুত্ব দিচ্ছে। প্রশাসন এখন বাস্তবতার দাবিতে উপনিবেশের খোলস থেকে বেরিয়ে জনবান্ধব হতে অনেকটা আন্তরিকতা দেখাচ্ছে। রাষ্ট্র পরিচালনায় সংবিধান যেমন অঙ্গীকারবদ্ধ হয় জনগণের সাথে তেমন প্রশাসনের জবাবদিহিতা ও সদাচার নিশ্চিতকল্পে এখন লাগসই মাধ্যম হিসেবে বেছে নেওয়া হচ্ছে 'বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি' (APA)-এর মতো কর্মকৌশল।

সার্বিকভাবে বিশ্বব্যবস্থা এখন অনুধাবন করছে দমন, নিপীড়নের মাধ্যমে রাষ্ট্র কাঠামো বা সমাজ কাঠামোর দীর্ঘমেয়াদি টিকে থাকা দুষ্কর। সমাজ এখন আর্থিক বুনিয়াদ মজবুত করতে বদ্ধপরিকর—এ যে টিকে থাকা দাওয়াই। বদলে যাওয়া পৃথিবীতে দ্রুত বদলে যাচ্ছে মানুষের জনরুচি, চাহিদা ও দর্শন। সংস্কৃতির উপাদান খাপ খাইয়ে চলছে প্রতিনিয়ত। শহর ও গ্রামের পোশাক থেকে খাদ্যাভ্যাস সবকিছুতে দূরত্ব কমে গিয়ে রাষ্ট্র আজ যেন একক সাংস্কৃতিক সোপান রচনা করছে। ব্যক্তি ও সমাজের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক রূপান্তর নিত্যদিনের ঘটনা। পুঁজিবাদী বিশ্বে পুঁজির দাস হিসেবে রত থেকেই নাগরিক কল্যাণে সমাজ ব্যবস্থায় গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিচ্ছে এবং মান্য করছে এটাই লাগসই ও জুতসই পদ্ধতি। গণতন্ত্রের প্রয়োগে নানা ব্যর্থতা ও ছলচাতুরী থাকলেও গণতন্ত্র তো জনসম্মতি, তথা সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে জনঅধিকার কেন্দ্রিক। গণতান্ত্রিক সমাজে মানুষের সামগ্রিক জীবনাচরণের যে দৃষ্টিভঙ্গি, বিধি ব্যবস্থা ও চেতনা বিদ্যমান তা মূল্যবোধ ভিত্তিক শান্তিঅন্বেষণী। এজন্যই সমাজের সাংস্কৃতিক পরিবেশের উৎকর্ষ অপরিহার্য। কিন্তু গণতন্ত্রের মন্দ দিকে উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক দেশের ন্যায় আমাদের বাংলাদেশে এক শ্রেণির মানুষের কু-প্রবৃত্তি ও পুঁজি পুঞ্জীভূত করা রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রশাসন তৃতীয় বিশ্বের দলকানা প্রশাসনকে রাজনৈতিক তল্পীবাহকদের পুঁজির পাহাড় গড়তে সহায়ক হয়। এজন্য সংস্কৃতির রূপান্তরে মানুষের মানবিক গুণ উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট না হয়ে সমাজ সংস্কৃতি মানুষকে ধাপিত করছে পুঁজির দিকে। এই দুর্বার আকর্ষণে মানুষ ভোগবাদে মত্ত হয়ে বিসর্জন দিচ্ছে নিজস্ব সংস্কৃতির লালিত মূল্যবোধকে—এ এক নির্মম বাস্তবতা।

সার্বিক পরিস্থিতি মানুষকে অসহিষ্ণু করে তুলছে তাই খুন, হত্যা, ধর্ষণের মতো অপরাধ এখন বিশ্বের সর্বত্র। সমাজ ব্যবস্থায় নৈতিকতার দায় রয়েছে আইনের শাসন, জনসার্বভৌমত্ব, জনঅধিকার, জনসম্মতি, সমঝোতা, ঐক্য ও সংহতি, নিয়মতন্ত্র ও প্রগতিশীলতার ওপর। এসব আজ কাগজের বয়ান। সমাজ চলছে পুঁজিবাদ, ভোগবাদ ও ক্ষমতার দাপটে। এজন্য সংস্কৃতি যেন প্রতিদিন রঙ বদলাচ্ছে সমাজপতিদের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে। সমাজের রূপ পরিবর্তনে সাংস্কৃতিক রূপায়ণের রূপ পরিবর্তন হয়। যখন বাংলার গ্রামগুলো স্ব-শাসিত ও স্ব-নির্ভর অনেকের মতে ক্ষুদ্র রাজ্য (Little Kingdom) ছিল। তখনকার সাংস্কৃতিক রূপরেখা আর চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের মধ্যে প্রবেশ করে সাংস্কৃতিক রূপরেখা যোজন যোজন পরিবর্তনের বাঁকে দাঁড়িয়ে।

গণতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার আফিম বিক্রি করছে বিশ্বমোড়ল আমেরিকা। গণতন্ত্রের সাথে শোভন সংস্কৃতি ও সদাচারের মিথস্ক্রিয়ার সমাজ গড়ে উঠবে তৈরি হবে সমাজের ভেতর থেকে সাংস্কৃতিক রূপরেখা। গণতন্ত্রের সাথে সংস্কৃতির সার্বিক উপযোগিতার বিষয়টি জড়িয়ে আছে। গণতন্ত্র সম্পর্কে বলা হয়—Democracy May either be a farm of government a form of State. A form of Society or Combination of all three.

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংস্কৃতি স্বশাসিত হয়ে আপনলয়ে নিজস্ব রূপরেখা তৈরি করবে। কিন্তু এখন সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি কি? চাহিদা কি? প্রার্থিত কি? মানুষ মানেই তো অর্থের লোভতাড়িত এক জীব। সে কেবল আয় করবে, পুঁজির দরে সমাজে অবস্থান নির্ণয় করবে ইত্যাদি। এখানে গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক যে সংস্কৃতি আমরা লালন করতাম তা অনেকাংশে অধুনালুপ্ত। বাঙালি সংস্কৃতির মোড়কীরূপ উনিশ শতকে গড়ে ওঠা পরশ্রমজীবী বাবু শ্রেণি তথা ভদ্রলোক মধ্যবর্তী শ্রেণি গড়ে তুলেছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে কবির ভাষায় বলা হতো—'তৈল ঢালা সিন্ধতনু নিদ্রারসে ভরা'। এরাই মূলত বাঙালি সংস্কৃতিকে রক্ষা কবচের মতো আঁকড়ে ছিল। আর গ্রামীণ কৃষিজীবী শ্রেণির যাপিতজীবনের গান, যাত্রা, পুথিপাঠ নির্ভর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তো আমরা নগরায়ণের নিশান উড়িয়ে অনেক আগেই ইতি টেনেছি।

আজ মানুষের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ আর্থিক বিচারে টিকে থাকা। সাংস্কৃতিক রূপরেখা কোনো নির্দিষ্ট ছাঁচে ধরা মুশকিল। বিশ্বায়নের হাওয়া এফোঁড়-ওফোঁড় করে বইছে সমাজে। এখন বিরাজমান মিশ্র সংস্কৃতি। নগরে সবাই বিচ্ছিন্ন তাই সামগ্রিক সাংস্কৃতিক চালচিত্রের পরিধি রচনা দুষ্কর। আমাদের আবহমান কালের 'ভেতো' বাঙালির খাদ্যাভাস থেকে বিনোদনের উপকরণেও ভিন্নতা বিরাজমান। পুঁজির সক্ষমতার সাথে মানুষের সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো খোলস পাল্টাচ্ছে। পুঁজির দাসের বর্তমান সমাজ কাঠামোতে দেখানিপনা, পুঁজির দাপট, ক্ষমতা সব দখলে নিচ্ছে। সাংস্কৃতিক চর্চার ক্লাব, সংগঠনে উন্নয়নশীল বিশ্বে রাজনীতিকরনের এক সাধারণ প্রপঞ্চ লক্ষণীয়। সাংগঠনিক সংগঠনের কর্মতৎপরতা লোপ পেয়েছে, যেটুকু অবশিষ্ট তা রাজনীতির অনুগত হাতিয়ার। সমাজপতিরা দান-দক্ষিণার মাধ্যমেও সংস্কৃতির গতির দেবতার আসনে আসীন। বাঙালি সংস্কৃতির যতটুকু আমরা বলি তা অনেকটাই লোক দেখানো। ভেতরে ভেতরে প্রতিদিন অন্তঃসার শূন্য হচ্ছে। আমরা আজ অচিন সংস্কৃতির অভিযাত্রী। অনেকেই বিজাতীয় সংস্কৃতির মিশেল বা অনুকরণের দোহাই দিবে কিন্তু আমাদের সমাজ ব্যবস্থায়-প্রয়োগ বিচারে তাও পুরোটা নয়। সংস্কৃতিতে আধুনিক প্রযুক্তির সংশ্লেষ এক অবধারিত বিষয়। নিজস্ব সংস্কৃতিকে সিল-গালা করে সংরক্ষণের সময় এখন নয়। রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে যেখানে সীমান্তের কাঁটাতার তুলে অভিন্ন দেশ, অভিন্ন মুদ্রা কিংবা গ্লোবাল ভিলেজের কনসেপ্টে মানবগ্রহ পৃথিবী চলমান। সেই পর্বে প্রযুক্তি তো দেশীয় সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলবেই। তবে সমস্যা হচ্ছে কুপ্রভাব এবং সেটা ভয়াবহ হয় আমরা যদি তা ডেকে নিয়ে আসি।

সব সাংস্কৃতিক উপাদানের সাথে প্রযুক্তির উপকরণ জড়াতে নেই। তাতে অনেক কিছু মৌলিকত্ব ও স্বকীয়তা হারায়। উদাহরণ টেনে বলা যায় লালন, হাসনের গানের সাথে একতারা, দোতারার পরিবর্তে আধুনিক যন্ত্র এই সংগীতগুলোর কি বারোটাই না বাজিয়েছে। এ ক্ষেত্রে মাটির সংস্কৃতির সুরক্ষার জন্য জাতীয় উদাসীনতাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার অবকাশ নেই। প্রযুক্তি তো চাকচিক্য